সপ্তবিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ; কালকন্যার উপাখ্যান

শ্লোক ১

নারদ উবাচ

ইত্থং পুরঞ্জনং সধ্র্যগ্বশমানীয় বিভ্রমৈঃ ।
পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্ ॥ ১ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পুরঞ্জনম্**—রাজা পুরঞ্জন; **সধ্র্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **বশমানীয়**—বশীভূত করে; **বিভ্রমৈঃ**—তার মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা; **পুরঞ্জনী**—রাজা পুরঞ্জনের পত্নী; **মহা-রাজ**—হে মহারাজ; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **রময়তী**—পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে রাজন্! বিভিন্নভাবে তাঁর পতিকে মোহিত করে এবং তাঁকে বশীভূত করে, রাজা পুরঞ্জনের পত্নী সর্বপ্রকারে তাঁর সন্তোষবিধান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনে শিকার করার পর, রাজা পুরঞ্জন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এবং স্নান করে ও উপাদেয় খাদ্য আহার করে তাঁর শ্রম উপশম করার পর, তিনি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পত্নী অবহেলিতার মতো বিনা শয্যায় এবং অবিন্যস্ত বসনে ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তখন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে শুরু করেছিলেন। জীব এইভাবে জড় জগতে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। জীবের পাপকর্মকে রাজা পুরঞ্জনের বনে শিকার করার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

যজ্ঞ, ব্রত, দান ইত্যাদি ধার্মীয় আচরণের মাধ্যমে পাপময় জীবনের প্রতিকার করা যায়। এইভাবে মানুষ পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার স্বাভাবিক কৃষ্ণচেতনাকে জাগরিত করতে পারে। গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর স্নান করে, এবং উপাদেয় খাদ্য আহারের দ্বারা নবীনতা লাভ করে, পুরঞ্জন যখন তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করছিলেন, তখন তাঁর পারিবারিক জীবনে শুভ চেতনার উদয় হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বেদবিহিত সুনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক জীবন দায়িত্বহীন পাপপূর্ণ জীবন থেকে অনেক ভাল। পতি ও পত্নী যদি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করে, তা হলে তা খুবই ভাল। কিন্তু, পতি যদি তার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তা হলে সে আবার জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই উপদেশ দিয়েছেন, *অনাসক্তস্য বিষয়ান্* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৫)। মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত না হয়ে, পতি ও পত্নী পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের জন্য একত্রে বসবাস করতে পারে। পতির কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া এবং পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণ হওয়া। এই সমন্বয় অত্যন্ত শুভ। কিন্তু, পতি যদি মৈথুন-সুখের জন্য পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে তাদের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সাধারণত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত কামুক। বলা হয় যে, স্ত্রীলোকদের যৌন বাসনা পুরুষদের থেকে নয়গুণ বেশি। তাই পুরুষদের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীদের শাড়ি, গয়না, ভাল ভাল খাবার ইত্যাদি দিয়ে এবং তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপে যুক্ত করার মাধ্যমে বশীভূত রাখা। স্ত্রীলোকদের অবশ্যই কয়েকটি সন্তান থাকা উচিত, তা হলে তারা পুরুষদের বিচলিত করবে না। দুর্ভাগ্যবশত, পুরুষেরা যদি কেবল যৌনসুখ উপভোগ করার জন্যই স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা হলে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত জঘন্য হয়ে ওঠে।

মহান রাজনীতিবিদ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—*ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ*—সুন্দরী স্ত্রী হচ্ছে শত্রু। অবশ্য প্রত্যেক পতির দৃষ্টিতেই তার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দর। অন্যদের কাছে সে সুন্দর বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তার পতি তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই সে সর্বদা তাকে অত্যন্ত সুন্দররূপে দর্শন করে। পতি যদি তার পত্নীকে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই আসক্তি হচ্ছে যৌন জীবনের প্রতি আসক্তি। সারা জগৎ রজ ও তমোগুণের দ্বারা মোহিত। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত কামুক এবং তমোগুণের প্রভাবে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন; তাই পুরুষদের কখনও তাদের সেই রজ ও তমোগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া

উচিত নয়। ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করার ফলে, মানুষ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে পারে। পতি যদি সত্ত্বগুণে স্থিত হন, তা হলে তিনি রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তার ফলে তাঁর কল্যাণ হয়। রজ ও তমোগুণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা বিস্মৃত হয়ে, তিনি তখন তাঁর সাত্ত্বিক পতির অনুগত হন এবং নিষ্ঠাপরায়ণ হন। এই প্রকার জীবন সকলের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তখন পুরুষ ও স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একত্রে কাজ করে, এবং তাঁরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু পতি যদি সত্ত্বগুণকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পত্নীর বশীভূত হন, তা হলে তিনি রজ ও তমোগুণের দাসত্ব করতে শুরু করেন, এবং তার ফলে সমস্ত পরিস্থিতি অত্যন্ত কলুষিত হয়ে যায়।

মূল কথা হচ্ছে যে, দায়িত্বহীন পাপময় জীবন থেকে গৃহস্থ-জীবন অনেক ভাল, কিন্তু গৃহস্থ-জীবনে পতি যদি পত্নীর অধীন হয়, তা হলে পুনরায় বৈষয়িক জীবন প্রবল হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষের জড় বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। তাই, বৈদিক পন্থায় এক বিশেষ বয়সে পুরুষদের সংসার-জীবন পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২

স রাজা মহিষীং রাজন্ সুস্নাতাং রুচিराননাম্ ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃপ্তামভ্যনন্দদুপাগতাম্ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি; **রাজা**—রাজা; **মহিষীম্**—রাণী; **রাজন্**—হে রাজন্; **সু-স্নাতাম্**—সুন্দরভাবে স্নান করে; **রুচির-আননাম্**—সুন্দর মুখ; **কৃত-স্বস্তি-অয়নাম্**—মঙ্গলজনক বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে; **তৃপ্তাম্**—সন্তুষ্ট; **অভ্যনন্দৎ**—তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন; **উপাগতাম্**—সমীপে আগতা।

অনুবাদ

রাণী স্নান করে মঙ্গলময় বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে, পান-ভোজনাদির দ্বারা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজা তাঁর সুন্দরভাবে সজ্জিত আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল দেখে, তাঁকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা সাধারণত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা নিজেদের সাজাতে চায়। কখনও কখনও তারা ফুল দিয়ে তাদের চুল সাজায়। তারা বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের সুন্দরভাবে সাজায়, কারণ তখন তাদের পতি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হওয়া স্ত্রীলোকেদের কর্তব্য, কারণ তাদের পতিরা যখন গৃহে ফিরে আসেন, তখন যাতে তাঁরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্ত্রী হচ্ছে সমস্ত শুভ বুদ্ধির অনুপ্রেরণা। পত্নীকে সুন্দরভাবে সজ্জিত দেখে, মানুষ তার পারিবারিক কর্তব্য সম্বন্ধে সংযত চিত্তে বিচার করতে পারে। মানুষ যখন পারিবারিক বিষয়ে অত্যন্ত বিচলিত থাকে, তখন সে তার কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। তাই পত্নীকে পতির অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করা হয়, এবং তার কর্তব্য হচ্ছে পতির বুদ্ধিকে আদর্শ অবস্থায় রাখা, যাতে তাঁরা উভয়ে মিলে নির্বিঘ্নে পারিবারিক কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

শ্লোক ৩

তয়োপগূঢ়ঃ পরিরব্ধকন্ধরো
রহোঽনুমন্ত্রৈরপকৃষ্টচেতনঃ ।
ন কালরংহো বুবুধে দুরত্যয়ং
দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

তয়া—রাণীর দ্বারা; **উপগূঢ়ঃ**—আলিঙ্গিত; **পরিরব্ধ**—বেষ্টন করেছিলেন; **কন্ধরঃ**—স্কন্ধদেশ; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **অনুমন্ত্রৈঃ**—গুহ্য ভাষণের দ্বারা; **অপকৃষ্ট-চেতনঃ**—চেতনা অধঃপতিত হয়েছিল; **ন**—না; **কাল-রংহঃ**—কালের প্রবাহ; **বুবুধে**—বোধ ছিল; **দুরত্যয়ম্**—দুরতিক্রম্য; **দিবা**—দিন; **নিশা**—রাত্রি; **ইতি**—এইভাবে; **প্রমদা**—রমণীর দ্বারা; **পরিগ্রহঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

রাণী পুরঞ্জনী যখন রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন রাজাও তাঁর বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর স্কন্ধদেশ বেষ্টন করেছিলেন। এইভাবে এক নির্জন স্থানে তাঁরা গুহ্য

ভাষণ করতে লাগলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা অত্যন্ত বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শুভ চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হয়ে কেবল তাঁর অনর্থক আয়ু ক্ষয় হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রমদা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দরী স্ত্রী অবশ্যই তাঁর পতিকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অবনতিরও কারণ। *প্রমদা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রেরণাদায়িনী' এবং 'প্রমত্তকারিণী'। সাধারণত গৃহস্থরা দিন ও রাত্রির প্রবাহকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষেরা মনে করে যে, স্বাভাবিকভাবেই দিন আসে এবং তারপর দিন শেষ হয়ে গেলে রাত্রি আসে। সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, সকাল বেলা যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন তা তার অবশিষ্ট আয়ু হরণ করে নিতে থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন আয়ু ক্ষয় হতে থাকে, এবং মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে, মূর্খ মানুষেরা কেবল নির্জন স্থানে তার পত্নীর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় *অপকৃষ্ট-চেতন* বা অধঃপতিত চেতনা। মনুষ্য-চেতনা কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু মানুষ যখন তার পত্নী এবং পারিবারিক বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন সে কৃষ্ণভক্তিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। তার ফলে কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও যে জীবনের একটি পলকও আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সেই কথা না জেনে সে অধঃপতিত হয়। জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি হচ্ছে কৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জীবন অতিবাহিত করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং জীবনের যথাযথ সদ্ব্যবহার হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত জীবন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। *শ্রম এব হি কেবলম্।* কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ হলে জীবনে কোন লাভ হয় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

খুব সুন্দরভাবে নিজের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও যদি কারও কৃষ্ণভক্তির পথে প্রগতি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, ব্যর্থ পরিশ্রমে কেবল তার সময় নষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৪

শয়ান উন্নদ্ধমদো মহামনা
মহার্হতল্পে মহিষীভুজোপধিঃ ।
তামেব বীরো মনুতে পরং যত-
স্তমোঽভিভূতো ন নিজং পরং চ যৎ ॥ ৪ ॥

শয়ানঃ—শয়ন করে; **উন্নদ্ধ-মদঃ**—অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **মহা-মনাঃ**—উন্নতচেতা; **মহা-অর্হ-তল্পে**—মূল্যবান শয্যায়; **মহিষী**—রানীর; **ভুজ**—বাহু; **উপধিঃ**—বালিশ; **তাম্**—তাঁর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বীরঃ**—বীর; **মনুতে**—তিনি মনে করেছিলেন; **পরম**—জীবনের লক্ষ্য; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **তমঃ**—অজ্ঞানের দ্বারা; **অভিভূতঃ**—আচ্ছন্ন; **ন**—না; **নিজম্**—তাঁর প্রকৃত সত্তা; **পরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **চ**—এবং; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

এইভাবে অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে, রাজা পুরঞ্জন উন্নত চেতনা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও তার পত্নীর বাহুকে উপাধান করে মহামূল্য শয্যায় সর্বদা শয়ন করে রইলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীকে তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হওয়ার ফলে, তিনি আত্মোপলব্ধির তাৎপর্য, এবং নিজেকে ও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। প্রথমে নিজেকে উপলব্ধি করতে হয়, যা এই শ্লোকে *নিজম্* বলে বর্ণিত হয়েছে। তারপর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন সে স্ত্রীসঙ্গকেই পরমার্থ বলে মনে করে। সেটিই হচ্ছে জড় আসক্তির মূল। সেই অবস্থায় মানুষ নিজেকে অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/২) তাই বলা হয়েছে—*মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।* কেউ যদি মহাত্মাদের বা ভক্তদের সঙ্গ করে, তা হলে তার মুক্তির দ্বার খুলে যায়, কিন্তু সে যদি স্ত্রীসঙ্গের প্রতি অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের প্রতি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে *তমোদ্বারম্* বা নরকের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশের দ্বার খুলে যায়।

রাজা পুরঞ্জন ছিলেন একজন মহান আত্মা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উন্নত চেতনা-সমন্বিত, কিন্তু রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ার ফলে, তাঁর চেতনা আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে মানুষের চেতনা মদ, মাংস ও মেয়ে-মানুষের দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তার ফলে মানুষ আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজেকে দেহের অতীত চিন্ময় আত্মারূপে জানা। আত্ম-উপলব্ধির পরবর্তী স্তরে মানুষ জানতে পারে যে, প্রতিটি আত্মা বা প্রতিটি জীব হচ্ছে পরমাত্মার বা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জীবেরাই হচ্ছে আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই প্রকৃতিতে অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম করছে।"

সমস্ত জীবেরাই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতায় স্ত্রী পুরুষ উভয়কে জীবনের শুরু থেকেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেওয়া হচ্ছে, এবং তার ফলে তারা আত্ম-উপলব্ধির পথে উন্নীত হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তারা জানে না যে, মনুষ্য-জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি লাভ না করতে পারা। সর্বদা অন্তরে মেয়েদের কথা চিন্তা করা মূল্যবান শয্যায় স্ত্রীসঙ্গে শয়ন করারই সামিল। হৃদয়টি হচ্ছে শয্যা, এবং সেটি হচ্ছে সবচাইতে মূল্যবান শয্যা। মানুষ যখন মেয়েমানুষ ও টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করে, তখন সে প্রেমিকা অথবা পত্নীর ভুজলতায় শয়ন করে। এইভাবে প্রবলভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়ার ফলে, সে আত্ম-উপলব্ধির অযোগ্য হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

তয়ৈবং রমমাণস্য কামকশ্মলচেতসঃ ।
ক্ষণার্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং নবং বয়ঃ ॥ ৫ ॥

তয়া—তাঁর সঙ্গে; **এবম্**—এইভাবে; **রমমাণস্য**—রতিসুখ উপভোগ করে; **কাম**—কামপূর্ণ; **কশ্মল**—পাপপূর্ণ; **চেতসঃ**—তাঁর হৃদয়; **ক্ষণ-অর্ধম্**—অর্ধক্ষণ; **ইব**—সদৃশ; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজন্; **ব্যতিক্রান্তম্**—অতিক্রান্ত; **নবম্**—নবীন; **বয়ঃ**—জীবন।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন কাম ও পাপপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন, এবং এইভাবে তাঁর নবযৌবন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

শ্রীল গোবিন্দ দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

এ ধন, যৌবন পুত্র, পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমলদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীল গোবিন্দ দাস ঠাকুর বলেছেন যে, যৌবনের যে কামভোগ তাতে কোন আনন্দ নেই। যৌবনে মানুষ নানা প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অত্যন্ত কামার্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়, অথবা বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রগতি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে উপভোগ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা সুন্দর রূপ দর্শন করতে, রেডিওতে জড়-জাগতিক সংবাদ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক গান শুনতে, সুন্দর ফুলের সৌরভ গ্রহণ করতে, এবং যুবতী রমণীর কোমল শরীর বা স্তন স্পর্শ করতে এবং ক্রমে ক্রমে জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। এগুলি পশুদের কাছেও অত্যন্ত সুখদায়ক; তাই মানব-সমাজে ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি বিষয় উপভোগের বিধিনিষেধ রয়েছে। কেউ যদি সেগুলি অনুসরণ না করে, তা হলে সে ঠিক একটি পশুর মতো হয়ে যায়।

তাই এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *কাম-কশ্মল-চেতসঃ*—রাজা পুরঞ্জনের চেতনা কামবাসনা ও পাপকর্মের দ্বারা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরঞ্জন যদিও উন্নতচেতা ছিলেন, তবুও তিনি সর্বক্ষণ তাঁর পত্নীর সঙ্গে কোমল শয্যায় শয়ন করে থাকতেন। তা ইঙ্গিত করে যে, তিনি রতিক্রিয়ায় অত্যধিক লিপ্ত ছিলেন। এই শ্লোকে *নবং বয়ঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। নবযৌবন বলতে জীবনের ষোল থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়সকে বোঝায়। জীবনের এই চৌদ্দ-পনের বছর অত্যন্ত প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে উপভোগ করা যায়। এই বয়সে মানুষ মনে করে যে, সে এইভাবে চিরকাল

ইন্দ্রিয় সুখভোগ করে যেতে পারবে, কিন্তু 'কাল ও জোয়ার কারও প্রতীক্ষা করে না।' যৌবনকাল অতি শীঘ্র অতিবাহিত হয়ে যায়। যে মানুষ যৌবনকালে পাপকর্ম করে জীবন অতিবাহিত করে, যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সে অত্যন্ত নিরাশ এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যারা কোন রকম পারমার্থিক শিক্ষালাভ করেনি, তাদের কাছেই যৌবনের জড় সুখ বিশেষভাবে সুখকর বলে মনে হয়। যারা কেবল দেহাত্ম-বুদ্ধিরই শিক্ষালাভ করেছে, তাদের জীবন প্রবল নিরাশায় পর্যবসিত হয়, কারণ জড় সুখ চল্লিশ বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। চল্লিশ বছরের পর তাকে এক নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে হয়, কারণ তার কোন রকম পারমার্থিক জ্ঞান নেই। এই প্রকার মানুষদের কাছে যৌবন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনই রাজা পুরঞ্জনের পত্নীর ভুজলতায় শয়ন করার সুখ অতি শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়েছিল।

কাম-কশ্মল-চেতসঃ শব্দটি সূচিত করে যে, প্রকৃতির নিয়মে মনুষ্য-জীবনে অসংযতভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেউ যদি অসংযতভাবে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগ করে, তা হলে তা পাপে পর্যবসিত হয়। পশুরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না। বছরের কোন বিশেষ মাসে পশুদের যৌন আবেদন অত্যন্ত প্রবল হয়। সিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী। সে মাংসাশী এবং অত্যন্ত বলবান, কিন্তু সে বছরে কেবল একবার যৌনসঙ্গ উপভোগ করে। তেমনই, ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে স্ত্রী ঋতুমতী হলে, মানুষের কেবল মাসে একবার স্ত্রীসঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তা হলে তাকে সম্ভোগ করা নিষিদ্ধ। সেটিই হচ্ছে মানুষের নিয়ম। মানুষকে একাধিক পত্নী গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ পত্নী গর্ভবতী হলে তার সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগ করা যায় না। সে যদি তখন মৈথুনসুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে সে অন্য পত্নীর কাছে যেতে পারে, যে গর্ভবতী নয়। এই নিয়মগুলি *মনুসংহিতা* ও অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সমস্ত নিয়ম এবং শাস্ত্র মানুষদের জন্য। কেউ যদি এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে, তা হলে তার পাপ হয়। অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ হচ্ছে পাপকর্ম। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বলতে শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে স্ত্রীসঙ্গ করাকে বোঝায়। কেউ যখন শাস্ত্র বা *বেদের* নিয়ম লঙ্ঘন করে, তখন সে পাপকর্ম করে। যারা পাপকর্মে লিপ্ত, তারা তাদের চেতনার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে *কশ্মল* বা পাপপূর্ণ চেতনাকে পরম পবিত্র কৃষ্ণচেতনায় পরিবর্তিত করা। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং*

পরমং ভবান্), শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পবিত্র, এবং আমরা যদি আমাদের চেতনাকে জড় সুখ থেকে কৃষ্ণতে পরিবর্তন করি, তা হলে আমরা পবিত্র হতে পারি। এই পন্থাটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *চেতোদর্পণ-মার্জনম্* বা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করার পন্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬

তস্যামজনয়ৎপুত্রান্ পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ ।
শতান্যেকাদশবিরাড়ায়ুষোহর্ধমথাত্যগাৎ ॥ ৬ ॥

তস্যাম্—তাঁর থেকে; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্র; **পুরঞ্জন্যাম্**—পুরঞ্জনীতে; **পুরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জন; **শতানি**—শত; **একাদশ**—এগারো; **বিরাট্**—হে রাজন; **আয়ুষঃ**—জীবনের; **অর্ধম্**—অর্ধেক; **অথ**—এইভাবে; **অত্যগাৎ**—অতিবাহিত করেছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ তখন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলেছিলেন—হে বিরাট (দীর্ঘ আয়ুষ্মান)! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর গর্ভে এগারো শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু, এই কার্যে তাঁর জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে *একাদশ শতানি।* পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর গর্ভে এগারো শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং সেই কার্যে তাঁর জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই তাই হয়। কেউ যদি বড় জোর একশ বছর বাঁচে, তা হলে সে তার গৃহস্থ-জীবনে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত কেবল সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে। দুর্ভাগ্যবশত এখন মানুষ একশ বছর পর্যন্ত বাঁচে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ষাট বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করে। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, পূর্বে মানুষ একশ থেকে দুইশ পুত্রকন্যা উৎপাদন করতেন। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখব যে, রাজা পুরঞ্জন কেবল এগারো শত পুত্রই উৎপাদন করেননি, একশ দশটি কন্যাও উৎপাদন করেছিলেন। এইভাবে বহু সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করার পরিবর্তে মানব-সমাজ এখন গর্ভনিরোধক পন্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত।

বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও তখনকার দিনে মানুষেরা শত-শত সন্তান উৎপাদন করতেন, তবুও তাঁরা কখনও গর্ভ-নিরোধনের পন্থা অবলম্বন করেননি। গর্ভনিরোধক পন্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আর একটি পাপকর্ম, কিন্তু এই কলিযুগে মানুষ এতই পাপী হয়ে গেছে যে, তাদের পাপকর্মের ফল যে কি হবে, সেই সম্বন্ধে গ্রাহ্যও করে না। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর সঙ্গে শয়ন করে বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, কিন্তু এই শ্লোকে তাঁদের গর্ভনিরোধক পন্থা অবলম্বন করার কোন উল্লেখ নেই। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে গর্ভ-নিরোধনের উপায় হচ্ছে যৌন জীবন থেকে নিবৃত্ত থাকা। এমন নয় যে, মানুষ অবাধে স্ত্রীসম্ভোগ করবে এবং কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে গর্ভনিরোধ করবে। মানুষের চেতনা যদি সুস্থ থাকে, তা হলে তিনি তাঁর ধর্মপত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে, এবং সেই পরামর্শের ফলে বুদ্ধিমত্তা সহকারে জীবনের মান নির্ধারণের যোগ্যতা অর্জন করে জীবনপথে অগ্রসর হন। অর্থাৎ, কেউ যদি সৌভাগ্যবশত সুশীলা ও বিবেকবতী পত্নী প্রাপ্ত হন, তা হলে পরস্পর আলোচনা করে তাঁরা স্থির করতে পারেন যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া, বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করা নয়। সন্তানদের *পরিণাম* বলা হয়, এবং মানুষ যখন তার শুভ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এই পরিণাম তাঁর কৃষ্ণভক্তির বিস্তার হওয়া উচিত।

শ্লোক ৭

দুহিতৄর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ ।
শীলৌদার্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে ॥ ৭ ॥

দুহিতৄঃ—কন্যাগণ; **দশ-উত্তর**—দশটি অধিক; **শতম্**—এক শত; **পিতৃ**—পিতা; **মাতৃ**—এবং মাতার মতো; **যশস্করীঃ**—যশস্বী; **শীল**—উত্তম আচরণ; **ঔদার্য**—উদারতা; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **উপেতাঃ**—সমন্বিত; **পৌরঞ্জন্যঃ**—পুরঞ্জনের কন্যাগণ; **প্রজা-পতে**—হে প্রজাপতি।

অনুবাদ

হে প্রজাপতি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে পুরঞ্জনের একশ দশটি কন্যাও উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতা ও মাতার মতো যশস্বী। তাঁরা সুশীলা, উদার ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী সমন্বিতা ছিলেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের বিধি অনুসারে উৎপন্ন সন্তান সাধারণত পিতা ও মাতার মতো সদ্‌গুণ-সমন্বিত হয়, কিন্তু অবৈধভাবে উৎপন্ন সন্তান প্রধানত বর্ণসংকর হয়। বর্ণসংকর সন্তান পরিবার, সমাজ এবং নিজেদের প্রতিও দায়িত্বহীন হয়। প্রাচীনকালে বর্ণসংকর রোধ করা হত গর্ভাধান সংস্কার পালন করার মাধ্যমে, অর্থাৎ ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করার মাধ্যমে। এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা পুরঞ্জন যদিও বহু সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, তবুও তারা বর্ণসংকর ছিল না। তারা সকলেই ছিল সৎ, সুশীল সন্তান, এবং তারা তাদের পিতামাতার মতোই সদ্‌গুণ সমন্বিত ছিল।

বহু সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করলেও, শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত মৈথুনসুখ উপভোগের বাসনা পাপময় বলে বিবেচনা করা হয়। কেবল মৈথুন-সুখই নয়, মাত্রাতিরিক্ত যে-কোন ইন্দ্রিয়-সুখই পরিণামে পাপজনক। তাই জীবনের শেষে স্বামী বা গোস্বামী হতে হয়। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ সন্তান উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে, বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে আমাদের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সন্ন্যাসীর উপাধি হচ্ছে স্বামী অথবা গোস্বামী, অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে বিরত থাকেন। খামখেয়ালীর বশে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করতে হলে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করার ব্যাপারে পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা পুরঞ্জনের গৃহস্থ-জীবন অবশ্যই অত্যন্ত সুখের ছিল। এই শ্লোকগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর এগারো শত পুত্র এবং একশ দশজন কন্যা ছিল। সকলেই কন্যার থেকে অধিক সংখ্যক পুত্র বাসনা করে, এবং যেহেতু পুরঞ্জনের কন্যার সংখ্যা পুত্রের থেকে কম ছিল, তাই মনে হয় রাজা পুরঞ্জন তাঁর গৃহস্থ-জীবনে অত্যন্ত সুখী ছিলেন।

শ্লোক ৮

স পঞ্চালপতিঃ পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্ধনান্ ।
দারৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৄঃ সদৃশৈর্বরৈঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; **পঞ্চাল-পতিঃ**—পঞ্চালের রাজা; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পিতৃ-বংশ**—পিতার বংশ; **বিবর্ধনান্**—বর্ধন করে; **দারৈঃ**—পত্নীসহ; **সংযোজয়াম্ আস**—বিবাহ করেছিল; **দুহিতৄঃ**—কন্যাগণ; **সদৃশৈঃ**—যোগ্য; **বরৈঃ**—পতিদের সঙ্গে।

অনুবাদ

তারপর পঞ্চালপতি রাজা পুরঞ্জন তাঁর পিতৃবংশ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রদের উপযুক্ত পত্নীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং তাঁর কন্যাদেরও যোগ্য বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে প্রত্যেকেরই বিবাহ করা উচিত। সন্তান উৎপাদনের জন্য পত্নীর পাণিগ্রহণ করা উচিত, এবং সন্তানেরা কালক্রমে পিণ্ডদান, দাহ আদি ঔর্ধ্বদেহিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করার মাধ্যমে, পূর্বপুরুষরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন। শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করাকে বলা হয় পিণ্ডোদক, এবং বংশধরদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা।

পঞ্চালের রাজা পুরঞ্জন কেবল তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনেই তৃপ্ত হননি, তিনি তাঁর এগারো শত পুত্র এবং একশ দশ কন্যার দাম্পত্য জীবনেরও আয়োজন করে গিয়েছিলেন। এইভাবে সম্ভ্রান্ত পরিবার রাজবংশের স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই শ্লোকের দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে যে, পুরঞ্জন তাঁর সমস্ত পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পুত্র ও কন্যাদের বিবাহের আয়োজন করা। বৈদিক সমাজে এটি পিতামাতার একটি দায়িত্ব। বিবাহের পূর্বে পুত্র ও কন্যাদের স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষ ও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত নয়। এই বৈদিক সামাজিক রীতিটি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অথবা বর্ণসংকর, যা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নামে প্রবলভাবে প্রচলিত হচ্ছে, তা রোধ করার ব্যাপারে খুব সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত এই যুগে পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কিন্তু তাঁদের পুত্রকন্যারা পিতামাতার ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহ করতে চায় না। তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে বর্ণসংকর প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্লোক ৯

পুত্রাণাং চাভবন্ পুত্রা একৈকস্য শতং শতম্ ।
যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেষু সমেধিতঃ ॥ ৯ ॥

পুত্রাণাম্—পুত্রদের ; **চ**—ও; **অভবন্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **এক-একস্য**—তাদের প্রত্যেকের; **শতম্**—শত; **শতম্**—শত; **যৈঃ**—যাদের দ্বারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পৌরঞ্জনঃ**—রাজা পুরঞ্জনের; **বংশঃ**—বংশ; **পঞ্চালেষু**—পঞ্চাল রাজ্যে; **সমেধিতঃ**—প্রবলভাবে বর্ধিত হয়েছিল।

অনুবাদ

পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্রদের প্রত্যেকের শত-শত পুত্র হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা পঞ্চাল রাজ্য ভরে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পুরঞ্জন হচ্ছে জীবাত্মা, এবং পঞ্চাল নগরীটি হচ্ছে দেহ। দেহ হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র, যাদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ।* দুটি অংশ রয়েছে—একটি হচ্ছে জীব (*ক্ষেত্রজ্ঞ*), এবং অন্যটি হচ্ছে জীবের দেহ (*ক্ষেত্র*)। দেহ সম্বন্ধে একটু বিচার করলেই যে-কোন জীব বুঝতে পারে যে, তার দেহটি হচ্ছে একটি আবরণ, এবং সেই দেহটি তার সম্পত্তি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সেই কথা বোঝা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে।* দেহের মালিক আত্মা দেহের ভিতরে রয়েছে। দেহটি হচ্ছে *পঞ্চাল-দেশ* বা কর্মের ক্ষেত্র, যেখানে জীব তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত থেকে উদ্ভূত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ-বিষয়কে ভোগ করে। এই জড় জগতে, সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত প্রতিটি জীব কর্ম ও তার ফল সৃষ্টি করে, যেগুলিকে এখানে রূপক অর্থে পুত্র ও পৌত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দুই প্রকার কর্ম এবং তার ফল রয়েছে—পুণ্য ও পাপ। এইভাবে আমাদের জড় অস্তিত্ব বিভিন্ন প্রকার কর্মফলের দ্বারা আবৃত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

"সকাম কর্ম ও মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান হচ্ছে দুটি বিষের ভাণ্ড। সেগুলিকে অমৃত বলে মনে করে যে তা পান করে, তাকে জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন শরীরে নানা প্রকার

দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই প্রকার জীবেরা নানা প্রকার কদর্য বস্তু ভক্ষণ করে এবং তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপের ফলে অধঃপতিত হয়।"

এইভাবে কর্ম ও কর্মফলের ক্ষেত্র, যার দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়, তার শুরু হয় যৌন জীবনের ফলে। পুরঞ্জন তার সন্তান উৎপাদন করার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করেছিল, এবং কালক্রমে তাঁর সন্তানেরাও সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করেছিল। এইভাবে জীব মৈথুন-পরায়ণ হয়ে, শত-সহস্র কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কেবল তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে থাকে এবং এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। অনেক পুত্র ও পৌত্র উৎপাদন করার ফলে, তথাকথিত সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এই সমস্ত জাতি, সমাজ, বংশ, রাষ্ট্র বিস্তৃত হয় কেবল যৌন জীবন থেকে। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—*যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৫)। গৃহমেধী হচ্ছে সে, যে এই জড় জগতে থাকতে চায়। অর্থাৎ, সে এই দেহে অথবা সমাজে থেকে বন্ধুত্ব, প্রেম ও প্রীতি উপভোগ করতে চায়। তার একমাত্র সুখ হচ্ছে মৈথুনসুখ উপভোগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সে নিজে মৈথুনসুখ উপভোগ করে সন্তান উৎপাদন করে, এবং তার সন্তানেরা কালক্রমে বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, এবং তাদের সন্তানেরা কালক্রমে বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে। এইভাবে সারা পৃথিবী জনসাধারণে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তারপর হঠাৎ জড়া প্রকৃতির নিয়মে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে জনসংখ্যা বিনষ্ট হয়, এবং তারপর আবার তাদের সৃষ্টি হয়। সেই পন্থার বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৯) বলা হয়েছে—*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।* কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাবে এই সমস্ত সৃষ্টি এবং বিনাশ মানব-সভ্যতার নামে চলছে। আত্মা ও পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানের অভাবে এই সংসার-চক্র নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে।

শ্লোক ১০

তেষু তদ্রিক্‌থহারেষু গৃহকোশানুজীবিষু ।
নিরূঢ়েন মমত্বেন বিষয়েষ্বন্ববধ্যত ॥ ১০ ॥

তেষু—তাদের প্রতি; **তৎ-রিক্‌থ-হারেষু**—তাঁর ধন লুণ্ঠনকারী; **গৃহ**—ঘর; **কোশ**—ধনাগার; **অনুজীবিষু**—অনুগামীদের; **নিরূঢ়েন**—গভীর; **মমত্বেন**—আসক্তির দ্বারা; **বিষয়েষু**—বিষয়ের প্রতি; **অন্ববধ্যত**—আবদ্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্র ও পৌত্রেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর গৃহ, কোষ, ভৃত্য, সহকারী আদি সমস্ত ধন-সম্পদের লুণ্ঠনকারী ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পুরঞ্জনের আসক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *রিক্‌থ-হারেষু* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী' পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বংশধরেরা চরমে মানুষের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করে। অনেক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রয়েছেন, যাঁরা প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জন করেছেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু চরমে তাঁদের সমস্ত ধনসম্পদ তাঁদের পুত্র ও পৌত্রেরা লুণ্ঠন করেছে। আমরা ভারতবর্ষে একজন শিল্পপতিকে দেখেছি, যিনি রাজা পুরঞ্জনের মতো যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং তার ছয় জন পত্নী ছিল। প্রত্যেক পত্নীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য তাঁকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হত। আমি যখন এক সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে, তাঁর প্রতিটি পুত্র ও কন্যার জন্য কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জোগাড় করার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাই শাস্ত্রে এই প্রকার শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অথবা কর্মীদের মূঢ় বলা হয়েছে। তারা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে ধন সঞ্চয় করে, এবং তাদের পুত্র ও পৌত্রদের সেই ধন অপচয় করতে দেখে তারা তৃপ্তি অনুভব করে। এই সমস্ত মানুষেরা প্রকৃত মালিককে তার ধন ফিরিয়ে দিতে চায় না। *ভগবদ্‌গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। তথাকথিত ধন উপার্জনকারীরা কেবল তাদের ব্যবসা ও উদ্যোগের নামে ভগবানের ধন চুরি করছে। সেই ধন সঞ্চয় করার পর, তা তাদের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা লুণ্ঠিত হতে দেখে তারা আনন্দ উপভোগ করে। সেটিই হচ্ছে বৈষয়িক জীবন। জড়-জাগতিক জীবনে জীব দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। তার ফলে তারা মনে করে, "এই শরীরটি হচ্ছে আমি", "আমি মানুষ", "আমি আমেরিকান", "আমি ভারতীয়"। অহঙ্কারের প্রভাবে এই দেহাত্মবুদ্ধির উদয় হয়। অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কোন বংশের, দেশের অথবা জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। এইভাবে জড় জগতের প্রতি তার আসক্তি

গভীর থেকে গভীরতর হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই প্রকার মানুষদের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* ষোড়শ অধ্যায়ে (১৬/১৩-১৫) বলা হয়েছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥

"আসুরিক মানুষেরা মনে করে—'আজ আমার কাছে এত ধন রয়েছে, এবং কাল আমার পরিকল্পনার দ্বারা আমি আরও ধন লাভ করব। এখন আমার এত রয়েছে, এবং ভবিষ্যতে তা আরও বর্ধিত হবে। সে আমার শত্রু ছিল, এবং আমি তাকে সংহার করেছি; আমার অন্যান্য শত্রুরাও নিহত হবে। আমিই হচ্ছি সব কিছুর অধীশ্বর, আমি ভোক্তা, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুখী। আমার অভিজাত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিবৃত আমিই হচ্ছি সবচাইতে ধনী ব্যক্তি। আমার মতো শক্তিশালী ও সুখী আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ করব, কিছু দান করব, এবং এইভাবে আমি সুখভোগ করব।' এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা এইভাবে অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত।"

এইভাবে মানুষ বিভিন্ন শ্রমসাপেক্ষ কার্যকলাপে যুক্ত হয়, এবং তাদের দেহ, গৃহ, পরিবার, রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি তাদের আসক্তি ক্রমশই অত্যন্ত গভীর হয়।

শ্লোক ১১

ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্নানাকামো যথা ভবান্ ॥ ১১ ॥

ঈজে—তিনি পূজা করেছিলেন; **চ**—ও; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **ঘোরৈঃ**—বীভৎস; **দীক্ষিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **পশু-মারকৈঃ**—যাতে পশুবধ করা হয়; **দেবান্**—দেবতাগণ; **পিতৄন্**—পিতৃপুরুষগণ; **ভূত-পতীন্**—ভূতপতিগণ; **নানা**—বিভিন্ন; **কামঃ**—সকাম; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! আপনার মতো রাজা পুরঞ্জনও বহু কামনাযুক্ত হয়ে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদের পূজা করেছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞ ছিল অত্যন্ত বীভৎস, কারণ পশুহত্যা করার বাসনায় সেগুলি সম্পাদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেবর্ষি নারদ প্রকাশ করেছেন যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই বর্ণনাটি ছিল মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের কার্যকলাপেরই রূপক। এই শ্লোকে নারদ মুনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, *যথা ভবান্*—অর্থাৎ ঠিক আপনার মতো, যা ইঙ্গিত করে যে, রাজা পুরঞ্জন হচ্ছেন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ স্বয়ং। পরম বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, নারদ মুনি যজ্ঞে পশুবলি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি যদি রাজাকে যজ্ঞ বন্ধ করার কথা বলতেন, তা হলে রাজা তাঁর কথা শুনতেন না। তাই তিনি তাঁকে পুরঞ্জনের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকে, "আপনার মতো" উক্তিটি ব্যবহার করে, পূর্ণরূপে না হলেও, তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতি আসক্ত কর্মীদের সাধারণত তাদের বংশধরদের জন্য বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় এবং বহু দেবদেবীর পূজা করতে হয়, সেই সঙ্গে বহু নেতা, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদেরও সন্তুষ্টিবিধান করতে হয়, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সমস্ত আয়োজন যথাযথভাবে হয়। আগামী দিনের মানুষেরা যাতে অত্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে, সেই ব্যাপারে তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত আগ্রহী, এবং সেই হেতু তারা রেলগাড়ির এঞ্জিন, মোটরগাড়ি, বিমান আদি চালাবার জন্য শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে, কারণ এখন পেট্রল, কয়লা ইত্যাদি ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা করে *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

"যারা আধ্যাত্মিক মার্গে রয়েছে, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়সংকল্প, এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি। হে কুরুনন্দন! যারা দৃঢ়সংকল্প নয়, তাদের বুদ্ধি বহু শাখায় বিভক্ত।"

প্রকৃতপক্ষে, যাঁরা জ্ঞানবান তাঁরা কৃষ্ণভক্তি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর, কিন্তু যারা মূর্খ (*মূঢ়াঃ*), পাপী (*দুষ্কৃতিনঃ*) ও নরাধম, যারা বুদ্ধিহীন *(মায়য়াপহৃত জ্ঞানাঃ)* এবং যারা আসুরিক মনোভাবাপন্ন (*আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ*), তারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়। তার ফলে তারা নানা প্রকার কর্মে লিপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ কার্যই পশুবধ কেন্দ্রিক। আধুনিক সভ্যতা পশুবধ কেন্দ্রিক। কর্মীরা ঘোষণা করছে যে, আমিষ আহার না করলে, তাদের ভিটামিন অথবা প্রাণশক্তি হ্রাস পাবে; তাই কঠোর পরিশ্রম করার উপযুক্ত স্বাস্থ্যের জন্য মাংস আহার করা অবশ্য কর্তব্য, মাংস হজম করার জন্য সুরা পান করা অবশ্য কর্তব্য, এবং মাংস আহার ও সুরা পানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্ত্রীসম্ভোগ করা অবশ্য কর্তব্য, যাতে তারা গাধার মতো কঠোর পরিশ্রম করতে পারে।

পশুবধ দুই প্রকার। একটি হচ্ছে ধর্মীয় যজ্ঞের নামে। বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর সব কটি ধর্মে উপাসনার স্থানে পশুবধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। বৈদিক সভ্যতায় মাংসাহারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধের মাধ্যমে কালী মন্দিরে পাঁঠা বলি দিয়ে, মাংস আহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনই দেবী চণ্ডিকার পূজা করে, সুরাপান করার নির্দেশ রয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত আচরণগুলির নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষ এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি বর্জন করেছে। এখন তারা সর্বত্র চোলাই মদের কারখানা আর কসাইখানা খুলে অবাধ মদ্যপান করছে এবং পশুমাংস আহার করছে। নারদ মুনির মতো বৈষ্ণব আচার্য খুব ভালভাবে জানেন যে, ধর্মের নামে যারা এইভাবে পশুহত্যা করে, তারা অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে, জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তাই দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে *শ্রীমদ্ভাগবত* সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময়, বেদের কর্মকাণ্ড শাখার নিন্দা করেছিলেন। নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছিলেন—

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥

"সাধারণত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভোগ করতে চায়, এবং তুমি ধর্মের নামে তাদের সেই বিষয়ে উৎসাহিত করেছ। তা নিন্দনীয় ও অযৌক্তিক। যেহেতু তারা তোমার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে, তাই তারা এই প্রকার কার্যকলাপকে ধর্ম অনুষ্ঠান বলে মনে করবে এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা কখনও ভাববে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৫)

শ্রীল নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বেদের অনুগামী বহু শাস্ত্র সংকলন করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, কারণ সেই সমস্ত শাস্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। নারদ মুনির নির্দেশে ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছিলেন, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের আরাধনা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর ভক্তরা কখনও ধর্মের নামে পশুহত্যা অনুমোদন করেন না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের নামে পশুহত্যা বন্ধ করার জন্য বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তমোগুণের প্রভাবে ধর্মের নামে যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হয়, সেই কথা *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮/৩১-৩২) ইঙ্গিত করা হয়েছে—

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্য্যমেব চ ।
অযথাবৎপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥

"হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয়, সেই বুদ্ধি রাজস। যে বুদ্ধি অজ্ঞান ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং ধর্মকে অধর্ম বলে মনে করে, এবং সব কিছু বিপরীতভাবে বোঝে, তা তামসী বুদ্ধি বলে জানবে।"

যারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা পশুবধ করার জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান তৈরি করে। প্রকৃত ধর্ম জড় জাগতিক কার্যকলাপের অতীত। শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন—সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হতে হবে (*সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য*)। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্ত ও প্রতিনিধিরা পরম ধর্মের শিক্ষা দেন, যাতে পশুহত্যার কোন স্থান নেই। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে ভারতের বহু তথাকথিত মিশনারীরা ধর্মের নামে অধর্মের প্রচার করছে। তারা একজন সাধারণ মানুষকে ভগবান সাজিয়ে সকলকে, এমন কি তথাকথিত সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত মাংস আহার করতে উপদেশ দিচ্ছে।

শ্লোক ১২

যুক্তেষ্বেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ ।
আসসাদ স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্ ॥ ১২ ॥

যুক্তেষু—হিতকর কার্যকলাপে; **এবম্**—এইভাবে; **প্রমত্তস্য**—অমনোযোগী হয়ে; **কুটুম্ব**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **আসক্ত**—অনুরক্ত; **চেতসঃ**—চেতনা; **আসসাদ**—

উপস্থিত হয়েছিল; **সঃ**—সেই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **কালঃ**—সময়; **যঃ**—যা; **অপ্রিয়ঃ**—প্রীতিজনক নয়; **প্রিয়-যোষিতাম্**—কামিনীর প্রিয় ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা পুরঞ্জন সকাম কর্মের প্রতি ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনের সেই অবস্থায় এসে উপনীত হলেন, যা কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রিয়যোষিতাম্* ও *অপ্রিয়ঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *যোষিৎ প্রিয়* কথাটির অর্থ 'যারা মেয়েদের সঙ্গ করতে ভালবাসে'। জড় সুখভোগের চরম অবস্থা হচ্ছে মৈথুন, এবং যারা সেই জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের কাছে মৃত্যু মোটেই প্রিয় নয়। এই সম্পর্কে একটি শিক্ষাপ্রদ কাহিনী রয়েছে। এক সাধু যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এক রাজকুমারের সাক্ষাৎ হয়, এবং সাধু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, "রাজকুমার, তুমি চিরজীবী হও।" তারপর সেই সাধুর সঙ্গে এক ভক্তের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁকে বলেন, "তুমি জীবিত থাকতে পার অথবা মরে যেতে পার।" তারপর সাধুর সঙ্গে এক ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, "তোমার এখনই মৃত্যু হোক।" অবশেষে সাধুর সঙ্গে এক ব্যাধের সাক্ষাৎ হয়, এবং তিনি তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, "তুমি জীবিত থেকো না এবং মরেও যেও না।" এই কাহিনীর সারমর্ম হচ্ছে যে, যারা অত্যন্ত কামুক এবং ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে লিপ্ত, তারা মরতে চায় না। রাজপুত্রের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যথেষ্ট ধনসম্পদ ছিল, তাই সেই মহান ঋষিটি তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি যেন চিরজীবী হন, কারণ যতক্ষণ তিনি বেঁচে থাকবেন, ততক্ষণ তিনি জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হবে। যেহেতু ব্রহ্মচারী ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন, তাই সেই ঋষি তাঁকে বলেছিলেন তাঁর যেন তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, কারণ তাঁর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন সমাপ্তি হয়ে, তিনি যেন ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পক্ষে বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়া দুই সমান, কারণ জীবিত অবস্থায় তিনি ভগবানের সেবা করেন এবং মৃত্যুর পরেও তিনি ভগবানের সেবা করতে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের কাছে ইহকাল ও পরকাল দুই সমান, কারণ উভয় অবস্থাতেই তিনি ভগবানের সেবা করেন। ব্যাধ যেহেতু পশুহত্যা করে অত্যন্ত জঘন্য জীবন যাপন করে, তাই তাকে মৃত্যুর পর নরকে যেতে হবে,

তাই তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল সে যেন জীবিত না থাকে এবং তার মৃত্যু যেন না হয়।

রাজা পুরঞ্জন অবশেষে বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন। বার্ধক্যে ইন্দ্রিয়গুলি দুর্বল হয়ে যায়, এবং যদিও বৃদ্ধরাও ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়, বিশেষ করে মৈথুনসুখ, কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়-সুখের যন্ত্রটি আর কাজ করে না, তাই তারা অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকার কামুক ব্যক্তিরা মৃত্যুর জন্য কখনই প্রস্তুত হয় না, তারা কেবল তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে তাদের আয়ু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। কিছু মূর্খ রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি দাবি করেছে যে, তারা বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে মানুষকে অমরত্ব দান করতে চলেছে। এই প্রকার উন্মাদ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে আজকের সভ্যতা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, চিরকাল বেঁচে থাকার বাসনা সত্ত্বেও, নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তাদের অন্য লোকে নিয়ে চলে যায়। এই প্রকার মনোভাব হিরণ্যকশিপু প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু যথা সময়ে ভগবান স্বয়ং এসে নিমেষের মধ্যে তাকে সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্বাধিপতির্নৃপ।
গন্ধর্বাস্তস্য বলিনঃ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্ ॥ ১৩ ॥

চণ্ডবেগঃ—চণ্ডবেগ; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বলোক-বাসী; **অধিপতিঃ**—রাজা; **নৃপ**—হে রাজন্; **গন্ধর্বাঃ**—অন্য গন্ধর্বগণ; **তস্য**—তাঁর; **বলিনঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী সৈনিক; **ষষ্টি**—ষাট; **উত্তর**—অধিক; **শত**—শত; **ত্রয়ম্**—তিন।

অনুবাদ

হে রাজন্! গন্ধর্বলোকের অধিপতি হচ্ছেন চণ্ডবেগ নামক রাজা। তাঁর অধীনে তিনশ ষাটজন অত্যন্ত শক্তিশালী গন্ধর্ব সৈনিক রয়েছে।

তাৎপর্য

কালকে এখানে চণ্ডবেগরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু সময় কারও প্রতীক্ষা করে না, তাই এখানে সময়কে চণ্ডবেগ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান'। কালের গতি বৎসররূপে গণনা করা হয়। এক

বছরে তিনশ ষাট দিন, এবং চণ্ডবেগের সৈন্যেরা সেই দিনগুলির প্রতীক। কাল অতি দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়; চণ্ডবেগের অত্যন্ত বলবান গন্ধর্ব সৈনিকেরা আমাদের জীবনের দিনগুলি দ্রুত গতিতে হরণ করে নেয়। সূর্য তার উদয় ও অস্তের মাধ্যমে আমাদের আয়ু ছিনিয়ে নেয়। এইভাবে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে, আমাদের সকলের আয়ু কিছুটা ক্ষয় হয়। তাই বলা হয় যে, আয়ু রক্ষা করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তা হলে সূর্য তাঁর সময় হরণ করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১৭) বলা হয়েছে *আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।* মূল কথা হচ্ছে যে, কেউ যদি অমর হতে চায়, তা হলে তাকে ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে, তা হলে সে কালক্রমে ভগবানের নিত্যধামে প্রবেশ করতে পারবে।

মরীচিকা ও অন্যান্য মায়িক বস্তুকে কখনও কখনও গন্ধর্ব বলা হয়। আয়ুক্ষয়কে বার্ধক্য বলা হয়। কালের এই অদৃশ্য গতি যা আয়ু হরণ করে, তাকে এই শ্লোকে আলঙ্কারিক ভাষায় গন্ধর্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত গন্ধর্বেরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই। তার অর্থ হচ্ছে যে, চণ্ডবেগরূপে বর্ণিত কালের অদৃশ্য প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই আয়ু ক্ষয় হয়।

শ্লোক ১৪

গন্ধর্ব্যস্তাদৃশীরস্য মৈথুন্যশ্চ সিতাসিতাঃ ।
পরিবৃত্ত্যা বিলুম্পন্তি সর্বকামবিনির্মিতাম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধর্ব্যঃ—গন্ধর্বীরা; **তাদৃশীঃ**—তেমনই; **অস্য**—চণ্ডবেগের; **মৈথুন্যঃ**—মৈথুন-সঙ্গিনীরা; **চ**—ও; **সিত**— শ্বেত; **অসিতাঃ**—কৃষ্ণ; **পরিবৃত্ত্যা**—পরিবেষ্টিত; **বিলুম্পন্তি**—তারা লুণ্ঠন করেছিল; **সর্ব-কাম**—সর্বপ্রকার ঈপ্সিত বস্তু; **বিনির্মিতাম্**—নির্মিত।

অনুবাদ

চণ্ডবেগের গন্ধর্ব-সৈনিকদের মতো সমসংখ্যক গন্ধর্বী ছিল, এবং তারা বারবার ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীগুলি লুণ্ঠন করেছিল।

তাৎপর্য

দিনগুলিকে চণ্ডবেগের সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাত্রি সাধারণত মৈথুনসুখ উপভোগের সময়। দিনকে শ্বেতবর্ণ বলে মনে করা হয়, এবং রাত্রিকে

কৃষ্ণবর্ণ বলে মনে করা হয়। আর এক দিক দিয়ে বিচার করলে, রাত্রি দুই প্রকার—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি এবং শুক্লপক্ষের রাত্রি। এই সমস্ত দিন ও রাত্রি একত্রে মিলিত হয়ে, আমাদের আয়ু হরণ করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আমরা যা কিছু সংগ্রহ করি তা লুণ্ঠন করে। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ মানে হচ্ছে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সমস্ত বস্তু নির্মাণ করা। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছে কিভাবে আরও বেশি করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। এই কলিযুগে মানুষের আসুরিক মনোভাব ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। সাধারণ গৃহস্থালির কার্যকলাপের জন্য কত প্রকার যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। বাসন ধোওয়ার জন্য মেসিন, মেঝে পরিষ্কার করার মেসিন, দাড়ি কামাবার মেসিন, চুল কাটার মেসিন—আজকাল সব কিছুই মেসিনের দ্বারা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে এই শ্লোকে *সর্বকাম-বিনির্মিতাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাল এতই প্রবল যে, সে কেবল আমাদের আয়ুই হরণ করে না, আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলিও ধ্বংস করে। তাই এই শ্লোকে *বিলুম্পন্তি* ('লুণ্ঠন') শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের জীবনের শুরু থেকেই সবকিছু লুণ্ঠন করা হচ্ছে।

আমাদের সম্পত্তির এই লুণ্ঠন শুরু হয় আমাদের জন্মের ক্ষণ থেকে। অবশেষে একদিন আসবে যখন মৃত্যু সবকিছু শেষ করে দেবে, এবং জীবকে পুনরায় জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের চক্র শুরু করার জন্য আর একটি দেহে প্রবেশ করে আর একটি জীবন শুরু করতে হবে। প্রহ্লাদ মহারাজ এই পন্থাটিকে *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০) বলে বর্ণনা করেছেন। জড়-জাগতিক জীবন মানে হচ্ছে চর্বিত বস্তুকে পুনরায় চর্বণ করা। জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন। বিভিন্ন দেহে জীব বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহ উপভোগ করে, এবং বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধার উদ্ভাবন করে সে চর্বিত বস্তু পুনরায় চর্বণ করতে থাকে। আখের রস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে বার করা হোক অথবা মেসিনে বার করা হোক, তার ফল একই—তা আখেরই রস। আখের রস বার করার নানা রকম পন্থা আমরা বার করতে পারি, কিন্তু তার ফল একই।

শ্লোক ১৫

তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা ।
হর্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎপ্রজাগরঃ ॥ ১৫ ॥

তে—তারা সকলে; **চণ্ডবেগ**—চণ্ডবেগের; **অনুচরাঃ**—অনুচরেরা; **পুরঞ্জন**—রাজা পুরঞ্জনের; **পুরম্**—নগরী; **যদা**—যখন; **হর্তুম্**—লুণ্ঠন করতে; **আরেভিরে**—আরম্ভ করেছিল; **তত্র**—সেখানে; **প্রত্যষেধৎ**—রক্ষা করেছিল; **প্রজাগরঃ**—সেই বিশাল সর্প।

অনুবাদ

গন্ধর্বরাজ চণ্ডবেগ ও তাঁর অনুচরেরা যখন পুরঞ্জনের নগরী লুণ্ঠন করতে শুরু করেছিল, তখন পঞ্চফণা বিশিষ্ট সর্পটি তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

কেউ যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, তখন তার প্রাণবায়ু বিভিন্ন স্বপ্নের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। সর্পের পাঁচটি ফণা ইঙ্গিত করে যে, প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পাঁচটি বায়ুর দ্বারা পরিবৃত। শরীর নিস্ক্রিয় থাকলেও প্রাণবায়ু সক্রিয় থাকে। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপে সক্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পর শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, যদিও বহু কষ্টে আরও দু-তিন বছর, বড় জোর পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত কর্মক্ষমতা বজায় থাকতে পারে। তাই সরকারি নিয়মে সাধারণত অবসর গ্রহণের বয়স হচ্ছে পঞ্চান্ন বছর। পঞ্চাশ বছরের পর যে শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাকে এখানে আলংকারিক ভাষায় পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ ।
পুরঞ্জন পুরাধ্যক্ষো গন্ধর্বৈর্যুযুধে বলী ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি; **সপ্তভিঃ**—সাত; **শতৈঃ**—শত; **একঃ**—একাকী; **বিশংত্যা**—কুড়িটিসহ; **চ**—ও; **শতম্**—শত; **সমাঃ**—বৎসর; **পুরঞ্জন**—রাজা পুরঞ্জনের; **পুর-অধ্যক্ষঃ**—নগরীর অধ্যক্ষ; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের সঙ্গে; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **বলী**—অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে।

অনুবাদ

গন্ধর্বদের সংখ্যা সাতশ কুড়ি হলেও, রাজা পুরঞ্জনের নগরীর অধ্যক্ষ পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি একাকী তাদের সঙ্গে একশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

৩৬০দিন এবং ৩৬০রাত্রি একত্রে চণ্ডবেগের (কালের) ৭২০জন সৈন্য। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে সেই সমস্ত সৈন্যদের সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করতে হয়। সেই যুদ্ধকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম সত্ত্বেও কিন্তু জীবের মৃত্যু হয় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা শাশ্বত—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

"আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যুও হয় না। সে রয়েছে এবং কখনও তার অস্তিত্ব লুপ্ত হবে না। সে অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং চিরপুরাতন। দেহকে হত্যা করা হলেও আত্মাকে কখনও হত্যা করা যায় না।" প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না, কিন্তু তাকে আজীবন প্রকৃতির কঠোর নিয়মের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। তাকে নানা প্রকার দুঃখদায়ক পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মনে করে যে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে সে খুব ভালভাবে অবস্থিত রয়েছে।

শ্লোক ১৭

ক্ষীয়মাণে স্বসম্বন্ধে একস্মিন্ বহুভির্যুধা ।
চিন্তাং পরাং জগামার্তঃ সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ ॥ ১৭ ॥

ক্ষীয়মাণে—সে যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল; **স্ব-সম্বন্ধে**—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু; **একস্মিন্**—একাকী; **বহুভিঃ**—বহু যোদ্ধার সঙ্গে; **যুধা**—যুদ্ধে; **চিন্তাম্**—দুশ্চিন্তা;

পরাম্—অত্যন্ত প্রবল; **জগাম**—লাভ করেছিল; **আর্তঃ**—দুঃখিত হয়ে; **স**—সঙ্গে; **রাষ্ট্র**—রাজ্যের; **পুর**—নগরীর; **বান্ধবঃ**—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব।

অনুবাদ

যেহেতু তাকে বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এবং তারা সকলেই ছিল এক-একজন বড় যোদ্ধা, তাই পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে এইভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখে, রাজা পুরঞ্জন এবং সেই নগরবাসী তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

জীব শরীরের অভ্যন্তরে বাস করে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সহ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এখানে সেই নগরীর নাগরিক এবং বন্ধুবান্ধব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বহু সৈন্যের সঙ্গে একাকী কিছুক্ষণ ধরে সংগ্রাম করা যায়, কিন্তু সর্বক্ষণ করা যায় না। জীব যদি ভাগ্যবান হয়, তা হলে সে এই শরীরে একশ বছর ধরে জীবন-সংগ্রাম করতে পারে, কিন্তু তারপর আর তার পক্ষে সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তখন জীব পরাজয় স্বীকার করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*বৃদ্ধকাল আওল সব সুখ ভাগল।* কেউ যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন আর জড় সুখভোগ করা সম্ভব হয় না। মানুষ সাধারণত মনে করে যে, ধর্ম আচরণ এবং পুণ্যকর্ম করতে হয় জীবনের শেষ পর্যায়ে। সেই সময় মানুষ সাধারণত চিন্তাশীল হয়ে ওঠে এবং ধ্যান করার নামে অবসর কাটাতে কিছু তথাকথিত যোগ অভ্যাস করে। কিন্তু যারা সারা জীবন ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় অতিবাহিত করেছে, তাদের পক্ষে ধ্যান করা একটি হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধ্যান একটি অত্যন্ত কঠিন পন্থা এবং তার অভ্যাস শুরু করতে হয় যৌবন থেকেই। ধ্যান করতে হলে, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকাল যারা কামভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের কাছে ধ্যান করা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন-সংগ্রামে এই প্রকার ধ্যান ব্যর্থ হয়। কখনও কখনও এই ধরনের ধ্যানের পন্থাকে transcendental meditation বলা হয়। রাজা পুরঞ্জন বা জীবাত্মা তাঁর কঠোর জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে, তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন সহ এই transcendental meditation-এর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

স এব পুর্যাং মধুভুক্পঞ্চালেষু স্বপার্ষদৈঃ ।
উপনীতং বলিং গৃহ্ণন্ স্ত্রীজিতো নাবিদদ্ভয়ম্ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুর্যাম্**—নগরীর মধ্যে; **মধু-ভুক্**—মৈথুনসুখ উপভোগ করে; **পঞ্চালেষু**—পঞ্চাল (পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়) রাজ্যে; **স্ব-পার্ষদৈঃ**—তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে; **উপনীতম্**—নিয়ে আসত; **বলিম্**—কর; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করে; **স্ত্রী-জিতঃ**—স্ত্রীর বশীভূত; **ন**—করেনি; **অবিদৎ**—উপলব্ধি; **ভয়ম্**—মৃত্যুভয়।

অনুবাদ

রাজা পুরঞ্জন পঞ্চাল নামক তাঁর রাজ্যে কর সংগ্রহ করে, নানা প্রকার মৈথুনসুখে মগ্ন থাকতেন। সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হয়ে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছেন।

তাৎপর্য

রাজা, রাষ্ট্রপতি, সচিব, মন্ত্রী আদি রাজকর্মচারীদের প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে, তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করার ক্ষমতা রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, এই কলিযুগে রাজকর্মচারীরা *(রাজন্যস্)* এবং সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, এমন কি মন্ত্রী, সচিব ও রাষ্ট্রপতিরাও কেবল তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করবে। সরকারের উপরওয়ালাদের ব্যয় অনেক বেশি, এবং তাই প্রতি বছর কর বৃদ্ধি না করলে সরকার চলতে পারে না। যে কর সংগ্রহ করা হয় তা সরকারি কর্মচারীদের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করা হয়। এই প্রকার দায়িত্বহীন রাজনীতিবিদেরা ভুলে যায় যে, এক সময় মৃত্যু এসে তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগ হরণ করে নেবে। তাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে, মৃত্যুর সময় সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এই প্রকার নাস্তিক্যবাদ চার্বাক নামক দার্শনিক বহুকাল পূর্বে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মত হচ্ছে, *"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"* তিনি আরও বলেছেন মানুষের মৃত্যু, পরবর্তী জীবন, পূর্বজীবন অথবা পাপজীবন সম্বন্ধে ভীত হওয়া উচিত নয়; কারণ দেহটি ভস্মীভূত হলে, সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এটিই হচ্ছে তাদের দর্শন। এই প্রকার দার্শনিক বিচার কাউকে মৃত্যু-ভয় থেকে রক্ষা করতে পারে না, এবং পরবর্তী জন্মের জঘন্য জীবন থেকেও রক্ষা করতে পারে না।

শ্লোক ১৯

**কালস্য দুহিতা কাচিৎত্রিলোকীং বরমিচ্ছতী ।
পর্যটন্তী ন বর্হিষ্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন ॥ ১৯ ॥**

কালস্য—ভয়ঙ্কর কালের; **দুহিতা**—কন্যা; **কাচিৎ**—কোন; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবনে; **বরম্**—পতি; **ইচ্ছতী**—বাসনা করে; **পর্যটন্তী**—সারা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে; **ন**—কখনই না; **বর্হিষ্মন্**—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ; **প্রত্যনন্দত**—তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন; **কশ্চন**—কেউ।

অনুবাদ

হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! ভয়ঙ্কর কালের কন্যা তখন পতির অন্বেষণে ত্রিলোক ভ্রমণ করছিল, কিন্তু কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি।

তাৎপর্য

যথাসময়ে যখন শরীর বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে অক্ষম হয়ে যায়, তখন জরা বা বার্ধক্যের কষ্ট দেখা দেয়। এই জগতে চার প্রকার কষ্ট রয়েছে—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কখনও এই চার প্রকার ক্লেশের সমাধান করতে পারেনি। জরা বা বার্ধক্যের অক্ষমতাকে এখানে আলংকারিক ভাষায় কালের কন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউই তাকে চায় না, কিন্তু সে যে-কোন ব্যক্তিকে তার পতিত্বে বরণ করতে উৎসুক। কেউই বৃদ্ধ ও অক্ষম হতে চায় না, তবুও সকলেরই জন্য তা অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ২০

**দৌর্ভাগ্যেনাত্মনো লোকে বিশ্রুতা দুর্ভগেতি সা ।
যা তুষ্টা রাজর্ষয়ে তু বৃতাদাৎপূরবে বরম্ ॥ ২০ ॥**

দৌর্ভাগ্যেন—দুর্ভাগ্যবশত; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **লোকে**—জগতে; **বিশ্রুতা**—বিখ্যাত; **দুর্ভগা**—অত্যন্ত ভাগ্যহীনা; **ইতি**—এইভাবে; **সা**—সে; **যা**—যে; **তুষ্টা**—সন্তুষ্ট হয়ে; **রাজ-ঋষয়ে**—মহান রাজাকে; **তু**—কিন্তু; **বৃতা**—স্বীকৃত হয়ে; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **পূরবে**—রাজা পূরুকে; **বরম্**—বর।

অনুবাদ

কালকন্যা (জরা) তার দুর্ভাগ্যবশত এই জগতে দুর্ভগা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজর্ষি পূরু তাকে বরণ করেছিলেন বলে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কালকন্যা তাঁকে বর প্রদান করেছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *সব সুখ ভাগল*—বার্ধক্যে সমস্ত সুখ লুপ্ত হয়ে যায়। তার ফলে কেউই বার্ধক্য বা জরাকে পছন্দ করে না। তাই কালকন্যা জরা *দুর্ভগা* নামে বিখ্যাত। কিন্তু এক সময় মহান রাজা যযাতি জরাকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্বশুর শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতির জরাকে বরণ করতে হয়েছিল। শুক্রাচার্যের কন্যার সঙ্গে যখন মহারাজ যযাতির বিবাহ হয়, তখন শর্মিষ্ঠা নামক এক বান্ধবী শুক্রাচার্যের কন্যার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কালক্রমে মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং শুক্রাচার্যের কন্যা সেই বিষয়ে তাঁর পিতার কাছে অভিযোগ করেন। তার ফলে শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। মহারাজ যযাতির পাঁচটি যুবক পুত্র ছিল, এবং তাঁর জরা গ্রহণ করে তাঁদের যৌবন বিনিময় করার জন্য তিনি তাঁদের সকলের কাছে আবেদন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র পূরু ব্যতীত সকলেই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পূরু যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন বলে, যযাতি তাঁকে তাঁর রাজ্য প্রদান করেন। বলা হয় যে, যযাতির অন্য দুই পুত্র তাঁর অবাধ্য হয়েছিল বলে, তিনি তাঁদের ভারতের বাইরে, খুব সম্ভবত তুরস্ক ও গ্রীস রাজ্যে রাজ্যশাসন করতে দেন। এখান থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ যত ধনসম্পদই সংগ্রহ করুক না কেন, বার্ধক্যে তা উপভোগ করা যায় না। পূরু যদিও তাঁর পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সেই ঐশ্বর্য তখন ভোগ করতে পারেননি, কারণ তিনি তাঁর যৌবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। মানুষের কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার জন্য বার্ধক্য পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। বার্ধক্যের অক্ষমতার ফলে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতিসাধন করা যায় না, তা তিনি জড়-জাগতিক বিচারে যতই ঐশ্বর্যশালী হোন না কেন।

শ্লোক ২১

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্ ।
বব্রে বৃহদ্‌ব্রতং মাং তু জানতী কামমোহিতা ॥ ২১ ॥

কদাচিৎ—এক সময়; **অটমানা**—ভ্রমণ করার সময়; **সা**—সে; **ব্রহ্মলোকাৎ**—সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোক থেকে; **মহীম্**—পৃথিবীতে; **গতম্**—এসে; **বব্রে**—প্রস্তাব করেছিল; **বৃহৎ-ব্রতম্**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; **মাম্**—আমাকে; **তু**—তখন; **জানতী**—জেনে; **কাম-মোহিতা**—কামাসক্ত হয়ে।

অনুবাদ

আমি যখন সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক থেকে এক সময় এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, তখন কালকন্যা ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন করছিল, এবং আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জেনে, তাঁকে অঙ্গীকার করার জন্য সে কামাসক্ত হয়ে আমার কাছে প্রস্তাব করে।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ তিনি কখনও স্ত্রীসঙ্গ করেননি। তার ফলে তিনি চিরতরুণ, জরা কখনও তাঁকে আক্রমণ করতে পারে না। বার্ধক্যের অক্ষমতা কেবল সাধারণ মানুষকেই আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু নারদ মুনি ছিলেন সর্বতোভাবে ভিন্ন। নারদ মুনিকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে কালকন্যা কামাসক্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিল। নারীর আকর্ষণ প্রতিহত করতে হলে, প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। তা বৃদ্ধদের পক্ষেও দুরূহ, অতএব যুবকদের আর কি কথা। যাঁরা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করছেন, তাঁদের দেবর্ষি নারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, যিনি জরার প্রস্তাব সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যারা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা জরার শিকার হয়, এবং তাদের আয়ু অতি শীঘ্র ক্ষয় হয়ে যায়। কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার না করা হলে, জরার শিকার হয়ে অচিরেই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।

শ্লোক ২২

ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং সুদুঃসহম্ ।
স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে ॥ ২২ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; **সংরভ্য**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **বিপুল**—অন্তহীন; **মদাৎ**—মোহবশত; **শাপম্**—অভিশাপ; **সু-দুঃসহম্**—অসহনীয়; **স্থাতুম্-অর্হসি**—আপনি থাকতে পারবেন;

ন—কখনই না; **একত্র**—এক স্থানে; **মৎ**—আমার; **যাচ্ঞা**—অনুরোধ; **বিমুখঃ**—প্রত্যাখ্যান করার ফলে; **মুনে**—হে মহান ঋষি।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—আমি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলে, সে আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, এক দুঃসহ অভিশাপ প্রদান করেছিল। সে বলেছিল, "হে মুনে! যেহেতু আপনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই জন্য আপনি কখনও এক স্থানে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারবেন না।"

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদের দেহ চিন্ময়। তাই জরা, ব্যাধি, জন্ম ও মৃত্যু তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। নারদ মুনি হচ্ছেন ভগবানের পরম দয়ালু ভক্ত, এবং তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা। অর্থাৎ, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সকলকে বৈষ্ণবে পরিণত করা। তাই ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন হয়, তার অতিরিক্ত সময় এক স্থানে থাকার প্রয়োজন তাঁর হয় না। যেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় ইতিমধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করছেন, তাই কালকন্যার অভিশাপ সৌভাগ্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ মুনির মতো ভগবানের অন্য বহু ভক্তরাও বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভগবানের মহিমা প্রচারের কার্যে যুক্ত রয়েছেন। এই প্রকার মহাপুরুষেরা জড় প্রকৃতির নিয়মের অতীত।

শ্লোক ২৩

ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্ ।
ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—তারপর; **বিহত-সঙ্কল্পা**—নিরাশ হয়ে; **কন্যকা**—কালকন্যা; **যবন-ঈশ্বরম্**—যবনদের রাজা; **ময়া উপদিষ্টম্**—আমার উপদেশ অনুসারে; **আসাদ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বব্রে**—গ্রহণ করেছিল; **নাম্না**—নামক; **ভয়ম্**—ভয়; **পতিম্**—তাঁর পতিরূপে।

অনুবাদ

এইভাবে আমার দ্বারা নিরাশ হয়ে, আমার উপদেশক্রমে সে ভয় নামক যবন রাজার সমীপবর্তী হয়েছিল, এবং তাঁকে তার পতিরূপে বরণ করেছিল।

তাৎপর্য

পরম বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, শ্রীনারদ মুনি সর্বদাই অন্যের উপকার করেন, এমন কি যে তাঁকে অভিশাপ দেয় তারও উপকার করেন। নারদ মুনি যদিও কালকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবুও কালকন্যা একটি আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কেউই তাকে আশ্রয় প্রদান করতে পারে না, কিন্তু বৈষ্ণব এই প্রকার হতভাগিনীকেও কোথাও না কোথাও আশ্রয় প্রদান করেন। জরা যখন আক্রমণ করে, তখন সকলেই দুর্বল হয়ে বিনষ্ট হয়। নারদ মুনি একাধারে কালকন্যাকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং সাধারণ কর্মীদের প্রতি-আক্রমণ করেছিলেন। কেউ যদি নারদ মুনির উপদেশ গ্রহণ করেন, তা হলে সেই মহান বৈষ্ণবের কৃপায় ভয়ের সাগর অচিরেই দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ২৪

ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্সিতং পতিম্ ।
সঙ্কল্পস্ত্বয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ঋষভম্—শ্রেষ্ঠ; **যবনানাম্**—অস্পৃশ্যদের; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বৃণে**—আমি বরণ করি; **বীর**—হে বীর; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **পতিম্**—পতি; **সঙ্কল্পঃ**—সঙ্কল্প; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **কৃতঃ**—যদি করা হয়; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—কখনই না; **রিষ্যতি**—বিফল হয়।

অনুবাদ

যবন রাজার কাছে গিয়ে কালকন্যা তাঁকে বলেছিল, "হে বীর! আপনি যবনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আমি আপনাকে আমার পতিরূপে বরণ করতে চাই। আমি জানি যে, আপনার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলে, কেউ নিরাশ হয় না।

তাৎপর্য

যবনানাম্ ঋষভম্ শব্দ দুটি যবনদের রাজাকে বোঝায়। যবন ও ম্লেচ্ছ সংস্কৃত শব্দ দুটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা বৈদিক নিয়ম পালন করে না। বৈদিক নিয়ম অনুসারে, মানুষের খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, শ্রীবিগ্রহকে মঙ্গল-আরতি নিবেদন করা, বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করা,

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করা এবং ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করা কর্তব্য। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও কর্তব্য, এবং যাঁরা গৃহস্থ তাঁদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের বৃত্তি অনুসারে কর্ম করা কর্তব্য। এইভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবন যাপন করা উচিত, এবং সেটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। যারা এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে না, তাদের বলা হয় *যবন* অথবা *ম্লেচ্ছ।* ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, এই শব্দগুলি অন্য দেশের কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে সূচিত করে। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে কোন প্রকার সংকীর্ণতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ ভারতবর্ষে বাস করুক অথবা ভারতের বাইরে বাস করুক, সে যদি বৈদিক বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ না করে, তা হলে তাকে *ম্লেচ্ছ* বা *যবন* বলে সম্বোধন করা হবে। যে ব্যক্তি বৈদিক বিধির শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি পালন করে না, তার নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি হয়। যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুসরণকারীরা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে, তাই তারা স্বভাবতই সুস্থ এবং নীরোগ থাকে।

যদি কেউ কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তিনি পঁচাত্তর অথবা আশি বছর বয়সেও একজন যুবকের মতো কার্য করতে পারেন। এইভাবে কালকন্যা কোন বৈষ্ণবকে পরাভূত করতে পারেন না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* লিখতে শুরু করেন, তবুও তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে এক অপূর্ব সাহিত্য প্রদান করে গেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেছিলেন বেশ বৃদ্ধ বয়সে, অর্থাৎ, তাঁদের কার্য থেকে এবং পারিবারিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, তবুও তাঁরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য *শ্রীশ্রীষড় গোস্বামীর অষ্টকে* লিখেছেন—

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

"আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—এই ষড়গোস্বামীবর্গকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে

গেছেন। তাই তাঁরা ত্রিভুবনে সম্মানিত হয়েছেন, এবং তাঁরা শরণ গ্রহণের যোগ্য কারণ তাঁরা ব্রজগোপিকাদের ভাবে মগ্ন হয়ে, সর্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন।"

এইভাবে বার্ধক্যের পরিণাম জরা ভক্তকে বিচলিত করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে ভক্ত নারদ মুনির আদেশ এবং দৃঢ়সংকল্প অনুসরণ করেন। সমস্ত ভক্তরা নারদ মুনির পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, কারণ তাঁরা নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে, অর্থাৎ *নারদ-পঞ্চরাত্র* বা *পাঞ্চরাত্রিক-বিধি* অনুসারে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্ত *পাঞ্চরাত্রিক-বিধি* এবং *ভাগবত-বিধি* অনুসরণ করেন। *ভাগবত-বিধি* মানে হচ্ছে প্রচারকার্য—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা। পাঞ্চরাত্রিক-বিধি হচ্ছে *অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্।* ভক্ত যেহেতু নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাই তাঁর জরা, ব্যাধি অথবা মৃত্যুর কোন ভয় থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে ভক্ত বৃদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো বার্ধক্যের লক্ষণগুলির দ্বারা তিনি পরাভূত হন না। তাই বার্ধক্য ভক্তকে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত করতে পারে না। জরা যখন ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন কালকন্যা ভক্তের ভয় হ্রাস করে। ভক্ত জানেন যে, মৃত্যুর পর তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, তাই তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। তাই বার্ধক্য ভক্তকে হতাশ করার পরিবর্তে নির্ভয় হতে সাহায্য করে এবং তার ফলে তিনি সুখী হন।

শ্লোক ২৫

দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ ।
যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

দ্বৌ—দুই প্রকার; **ইমৌ**—এই; **অনুশোচন্তি**—শোক করে; **বালৌ**—অজ্ঞ; **অসৎ**—মূর্খ; **অবগ্রহৌ**—পন্থা অবলম্বন করে; **যৎ**—যা; **লোক**—প্রথা অনুসারে; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র অনুসারে; **উপনতম্**—দান করা; **ন**—কখনই না; **রাতি**—অনুসরণ করে; **ন**—নয়; **তৎ**—তা; **ইচ্ছতি**—বাসনা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি লৌকিক প্রথা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান করে না এবং কেউ দান করতে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করে না, তারা উভয়েই তমোগুণের দ্বারা

আচ্ছন্ন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অজ্ঞানের পথ অনুসরণ করছে। তাদের অবশ্যই পরিণামে শোক করতে হবে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ মঙ্গলময় জীবনযাপন করতে চান, তা হলে তাঁকে নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১৬/২৩) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, সে কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, সুখভোগ করতে পারে না, এবং পরম গতি প্রাপ্ত হতে পারে না।" যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না, সে জীবনে কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না অথবা সুখী হতে পারে না। অতএব তার ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ করে, তা হলে গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় বা শাসকের তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। যেহেতু নারদ মুনি কালকন্যাকে যবন রাজার কাছে সমর্পণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই যবনরাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। শাস্ত্র-নির্দেশের আলোকে সমস্ত আচরণ করা উচিত। শাস্ত্রনির্দেশ নারদ মুনির মতো মহাজনদের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। সেই সম্বন্ধে নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য।* সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ পালন করা উচিত। তার ফলে নিশ্চিতভাবে জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায়। কালকন্যা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশ অনুসারে যবন রাজার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। তাই তাকে অস্বীকার করার কোন কারণ ছিল না।

শ্লোক ২৬

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু।
এতাবান্ পৌরুষো ধর্মো যদার্তাননুকম্পতে ॥ ২৬ ॥

অথো—অতএব; **ভজস্ব**—গ্রহণ কর; **মাম্**—আমাকে; **ভদ্র**—হে ভদ্র; **ভজন্তীম্**—সেবা করতে ইচ্ছুক; **মে**—আমাকে; **দয়াম্**—দয়া; **কুরু**—কর; **এতাবান্**—এই

প্রকার; **পৌরুষঃ**—পুরুষের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যৎ**—যা; **আর্তান্**—দুর্দশাগ্রস্তকে; **অনুকম্পতে**—করুণা প্রকাশ করে।

অনুবাদ

কালকন্যা বলল—হে ভদ্র! আমি আপনার সেবা করবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত। দয়া করে আমাকে গ্রহণ করে, আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে আর্তের প্রতি করুণা প্রকাশ করা।

তাৎপর্য

যবনরাজ কালকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নারদ মুনির আদেশে কালকন্যার অনুরোধ বিবেচনা করেছিলেন। তাই তিনি অন্য আর একভাবে কালকন্যাকে অঙ্গীকার করছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নারদ মুনির আদেশ বা ভক্তির পন্থা ত্রিভুবনের সকলেরই পালনীয়, এমন কি যবন-রাজেরও। ভক্তিযোগের পন্থা পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে প্রচার করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সকলকে অনুরোধ করেছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকেরা বাস্তবিকভাবে দেখেছেন যে, নারদ মুনির *পাঞ্চরাত্রিক-বিধির* বলে যবন এবং ম্লেচ্ছরাও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছেন। মানব-সমাজ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, গুরুপরম্পরার ধারা অনুসরণ করে, তখন সারা জগৎ লাভবান হয়।

শ্লোক ২৭

কালকন্যোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ ।
চিকীর্ষুর্দেবগুহ্যং স সস্মিতং তামভাষত ॥ ২৭ ॥

কাল-কন্যা—কালের কন্যা; **উদিত**—উক্ত; **বচঃ**—বাণী; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **যবন-ঈশ্বরঃ**—যবনরাজ; **চিকীর্ষুঃ**—সম্পাদন করার ইচ্ছায়; **দেব**—দেবতাদের; **গুহ্যম্**—গোপনীয় কর্তব্য; **সঃ**—তিনি; **স-স্মিতম্**—ঈষৎ হেসে; **তাম্**—তাকে; **অভাষত**—বলেছিল।

অনুবাদ

কালকন্যার কথা শুনে যবনরাজ ঈষৎ হেসে, দৈবের বিধান অনুসারে তাঁর গোপনীয় কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। কালকন্যাকে সম্বোধন করে তিনি তখন বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

প্রকৃতপক্ষে পরম ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং অন্য সকলেই হচ্ছেন তাঁর ভৃত্য। যবনরাজও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস। তার ফলে তিনিও কালকন্যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। যদিও কালকন্যা মানে হচ্ছে জরা বা বার্ধক্য, তাই যবনরাজ কালকন্যাকে সর্বত্র প্রবর্তন করিয়ে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ বার্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। মূর্খ মানুষেরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপেই লিপ্ত থাকে, যেন তারা চিরকাল জীবিত থেকে জড়-জাগতিক উন্নতি উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড়-জাগতিক উন্নতি বলে কিছু নেই। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মনে করে যে, জড় ঐশ্বর্য তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু যদিও জড় বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তবুও মানব-সমাজের সমস্যাগুলির কোন সমাধান হয়নি—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, তারা অনেক জড়-জাগতিক উন্নতিসাধন করেছে। কালকন্যা বা বার্ধক্যের জরা যখন তাদের আক্রমণ করে, তখন তারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়, যদি তারা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যারা বিকৃতমস্তিষ্ক, তারা মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, এবং মৃত্যুর পর যে কি হবে তাও তারা জানে না। ভ্রান্তিবশত তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পর আর জীবন নেই, এবং তাই তারা এই জীবনে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে আচরণ করে অবাধে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়। বার্ধক্য বুদ্ধিমান মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত। যবনরাজ তাই কালকন্যাকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ময়া নিরূপিতস্তুভ্যং পতিরাত্মসমাধিনা ।
নাভিনন্দতি লোকোঽয়ং ত্বামভদ্রামসম্মতাম্ ॥ ২৮ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত; **তুভ্যম্**—তোমার জন্য; **পতিঃ**—পতি; **আত্ম**—মনের; **সমাধিনা**—ধ্যানের দ্বারা; **ন**—কখনই না; **অভিনন্দতি**—সাদরে গ্রহণ

করে; **লোকঃ**—মানুষ; **অয়ম্**—এই সমস্ত; **ত্বাম্**—তুমি; **অভদ্রাম্**—অশুভ; **অসম্মতাম্**—অস্বীকার্য।

অনুবাদ

যবনরাজ বললেন—বহু বিবেচনা করে আমি জানতে পেরেছি কে তোমার পতি হবে। প্রকৃতপক্ষে সকলের কাছে তুমি অমঙ্গলরূপা এবং অপ্রিয়া। তাই যেহেতু কেউই তোমাকে চায় না, তা হলে কেই বা তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে?

তাৎপর্য

বহু বিচার-বিবেচনা করার পর যবনরাজ স্থির করেছিলেন, কিভাবে সেই অশুভ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা যায়। কালকন্যা ছিল অমঙ্গল-স্বরূপা, এবং তাই কেউই তাকে চায়নি, কিন্তু ভগবানের সেবায় সকলকেই ব্যবহার করা যায়। তাই যবনরাজ কালকন্যাকেও ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই উদ্দেশ্য পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে—অর্থাৎ মানুষের মনে ভয় উৎপাদনের দ্বারা কৃষ্ণভক্তিতে তাদের যুক্ত করে, পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি জরারূপী কালকন্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ত্বমব্যক্তগতির্ভুঙ্‌ক্ষ্ব লোকং কর্মবিনির্মিতম্ ।
যাহি মে পৃতনাযুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি ॥ ২৯ ॥

ত্বম্—তুমি; **অব্যক্ত-গতিঃ**—যার গতিবিধি অদৃশ্য; **ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **লোকম্**—এই জগৎ; **কর্ম-বিনির্মিতম্**—সকাম কর্মের দ্বারা নির্মিত; **যা**—যে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার; **পৃতনা**—সৈনিক; **যুক্তা**—সহায়তার দ্বারা; **প্রজা-নাশম্**—জীবদের সংহার ; **প্রণেষ্যসি**—বিনা বাধায় তুমি করতে পারবে।

অনুবাদ

এই জগৎ সকাম কর্মের ফলস্বরূপ। তাই তুমি অলক্ষিতভাবে জীবদের আক্রমণ কর। আমার সৈনিকদের সহায়তায় তুমি নির্বিঘ্নে তাদের সংহার করতে পারবে।

তাৎপর্য

কর্ম-বিনির্মিতম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সকাম কর্মের দ্বারা নির্মিত।' সমগ্র জড়-জগৎ, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, সকাম কর্মের ফলস্বরূপে প্রকাশিত। সকলেই

এই পৃথিবীকে বড় বড় রাস্তা, গাড়ি, বিদ্যুৎ-শক্তি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, উদ্যোগ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির দ্বারা সাজাতে ব্যস্ত। যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে মগ্ন এবং তাদের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের কাছে এগুলি অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) বর্ণনা করা হয়েছে—

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়ম্
অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

যারা আত্মজ্ঞানবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে উন্মাদের মতো আগ্রহী, তারা কেবল তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সব রকম পাপকর্ম করে। ঋষভদেবের মতে, এই সমস্ত কার্যকলাপ অমঙ্গলজনক কারণ তা মানুষকে পরবর্তী জীবনে এক ঘৃণ্য শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সকলেই দেখতে পায় যে, যদিও তারা জড় দেহটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার বহু চেষ্টা করছে, তবুও তা সর্বদা ত্রিতাপ দুঃখ এবং নানা প্রকার বেদনা দিচ্ছে। তা না হলে, এত হাসপাতাল, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের কি আবশ্যকতা? প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে সুখ নেই। মানুষেরা কেবল দুঃখের নিবৃত্তি-সাধনের চেষ্টা করছে। মূর্খ মানুষেরা দুঃখকে সুখ বলে মনে করে; তাই যবনরাজ অলক্ষিতভাবে মূর্খ মানুষদের জরা, ব্যাধি এবং চরমে মৃত্যুর দ্বারা আক্রমণ করতে স্থির করেছিলেন। নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর জন্ম হয়। তাই যবনরাজ স্থির করেছিলেন যে, কালকন্যার মাধ্যমে কর্মীদের হৃদয়ে মৃত্যুভয় উৎপাদন করা, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, জড়-জাগতিক উন্নতি প্রকৃতপক্ষে উন্নতি নয়। প্রতিটি জীব হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, এবং তাই আধ্যাত্মিক প্রগতিসাধন না করলে, মনুষ্য-জীবন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ৩০

প্রজ্বারোঽয়ং মম ভ্রাতা ত্বং চ মে ভগিনী ভব ।
চরাম্যুভাভ্যাং লোকেঽস্মিন্নব্যক্তো ভীমসৈনিকঃ ॥ ৩০ ॥

প্রজ্বারঃ—প্রজ্বার নামক; **অয়ম্**—এই; **মম**—আমার; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **মে**—আমার; **ভগিনী**—ভগিনী; **ভব**—হও; **চরামি**—আমি বিচরণ করব; **উভাভ্যাম্**—তোমাদের উভয়ের দ্বারা; **লোকে**—এই জগতে; **অস্মিন্**—এই; **অব্যক্তঃ**—অলক্ষিত; **ভীম**—ভয়ঙ্কর; **সৈনিকঃ**—সৈনিক।

অনুবাদ

যবনরাজ বললেন—এই প্রজ্বার আমার ভ্রাতা। আমি এখন তোমাকে আমার ভগিনীরূপে গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের দুজনকে এবং আমার ভয়ঙ্কর সৈনিকদের নিযুক্ত করব এই জগতে অলক্ষিতভাবে কার্য করার জন্য।

তাৎপর্য

নারদ মুনি কালকন্যাকে যবনরাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার পরিবর্তে, যবনরাজ তাকে তাঁর ভগিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যারা বৈদিক বিধি অনুসরণ করে না, তারা অসংযতভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে। তার ফলে তারা কখনও কখনও তাদের ভগ্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে ইতস্তত করে না। এই কলিযুগে তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যবনরাজ যদিও নারদ মুনির প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর অনুরোধ অঙ্গীকার করেছিলেন, তবু তিনি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের কথা চিন্তা করছিলেন। তার কারণ হচ্ছে যে, তিনি যবন ও ম্লেচ্ছদের রাজা ছিলেন।

প্রজ্বার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে 'ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা প্রেরিত জ্বর'। এই জ্বর সর্বদা ১০৭ডিগ্রী তাপমাত্রায় থাকে, যে তাপমাত্রায় মানুষের মৃত্যু হয়। এইভাবে ম্লেচ্ছ ও যবনদের রাজা কালকন্যাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ভগিনী হতে। তাঁকে পত্নী বানাবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কারণ যবন ও ম্লেচ্ছরা যৌন সঙ্গ করার ব্যাপারে কোন রকম বাছবিচার করে না। তারা তাদের বোন, মা অথবা কন্যার সঙ্গেও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। যবনরাজের ভ্রাতা ছিল প্রজ্বার, এবং কালকন্যা ছিল জরা। যবনরাজের সংঘবদ্ধ সৈন্যশক্তির দ্বারা, অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, অবৈধ যৌনসঙ্গ, এবং চরমে মারাত্মক জ্বর ইত্যাদির সহায়তায় তারা জড়-জাগতিক জীবনকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, নারদ মুনির উপর জরার কোন প্রভাব ছিল না। তেমনই জরা বা ধ্বংসাত্মক শক্তি নারদ মুনি বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুগামীদের উপরও আক্রমণ করতে পারে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ; কালকন্যার উপাখ্যান' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।